দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন পটভূমি এবং সৃজনমুখর জীবনের পর্ব বিভাজন

261463

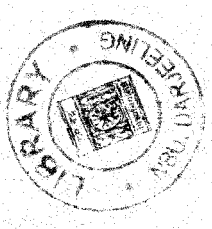

18 AUG 2013

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন-পটভূমি এবং সৃজনমুখর জীবনের পর্ব বিভাজন

১৯৫৯ সালে মনোজ মিত্র যখন নিজের প্রথম নাটকটি লিখলেন, গণনাট্যের পথ বেয়ে নবনাট্যের আবির্ভাবের পরও তখন কেটে গেছে অনেকটা সময়। নাট্যজগতে তখন দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েন — শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত। স্থূল বিভাজনে এঁদের একজনের কাজে অনুভূতির প্রাধান্য, অপরজনের কাজে বক্তব্যের। এই দুই ধারাকে মেলালেন মনোজ মিত্র নিজের নাটকে। তাঁর নাটক রচনার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে চমৎকার চিহ্নিত করেছেন কুমার রায় মহাশয়ঃ

> ''স্বাধীনতার পর যে নতুন ভাবনা, যে নতুন দায়িত্ববোধ, যে নতুন উত্তেজনা — তখন তার অবসান ঘটেছে। রাজনৈতিক আকাশ সমাকীর্ণ নানান সুবিধাবাদের জঞ্জালে। মানুষের বাঁচার সমস্যা নতুন মাত্রা পেয়েছে। অনুভূতিশীল আধুনিক মানুষের অসহায় এবং নিঃসঙ্গ আর্তি ফুটে উঠেছে তখন ধনবাদী সভ্যতার ব্যাধি নিয়ে। সে এক ক্ষুব্ধ-অস্থির উৎকেন্দ্রিক সময়। যে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা মানুষের মুক্তি দিতে পারে — সেই বিশ্বাসের আধারে বেনোজল ঢুকে পড়েছে — বিশ্বাস টুকরো হয়ে গেছে। ... প্রথম যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ি আন্দোলন পর পর দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ... এরই মধ্যে সত্তর দশকের টালমাটাল অবস্থা, জরুরী অবস্থা, মৃত্যু, বিভীষিকা, বামফ্রন্টের বিজয়, প্রতিষ্ঠা, শাসন ও রাজত্বকাল। এই সময়কালে মনোজ মিত্র নাটক লিখেছেন।''[১]

সমাজ-রাজনীতির নিপুণ পর্যবেক্ষণ এবং উপস্থাপন আছে মনোজ মিত্রের নাটকে। বিশেষ সামাজিক অবস্থায় পতিত মানুষের সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি, তবে তা কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের অনুগামী হয়ে নয়। কারণ ঃ ''মনোজ গণনাট্য সংঘ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার দাবী করেন নি কখনো। বরং তিনি এসব থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছেন।''[২] স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ তা তখন ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে নিঃসঙ্গতাবোধ, আশ্রয়হীনতার সমস্যা। নিজের কালের সেই সমস্যা মনোজের মিত্রের নাটকে বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ক্রমাগত প্রতিবাদ এবং শত্রু সংহার করতে গিয়ে বাংলা নাটক যখন রূপের দিক থেকে ক্রমশ দীন হয়ে পড়ছে, তখন তিনি বাংলা নাটকে নিয়ে এলেন 'আলো ছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ'কে। তাঁর প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই কেন্দ্রে আছে একজন অসহায় গড় মানুষ। তাঁর ভাষায় ঃ "My protagonists are always from a lower strata of life. From matla in Chak Bhanga Modhu to Munni who is just a nobody in the world, all are rootless, useless fellows."[৩] সে মানুষ কখনো পরিবার, কখনো সমাজ, কখনো বা রাজনীতি দ্বারা নির্যাতিত। সহজ ইচ্ছাপূরণ নয়, নাট্যিক শর্ত মেনেই তিনি দেখান সেই মানুষের ঘুরে

দাঁড়ানো। এই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে উচ্চকিত রাজনৈতিক তত্ত্ব নেই, আরোপিত আদর্শবাদ নেই – আছে মানুষের জন্য মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা আর সহমর্মিতা। কোনো বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া নয়, পাঠক-দর্শকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা নয়, এ যেন শুধু নিজের অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর নাটকের মূল সুরটিকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে ঃ

> "দেশ, কাল, ইতিহাস, সমাজ, ব্যক্তির সঙ্কট, অসহায়তায় তিনি অবিরত আলোড়িত, ব্যথিত হয়েছেন। জীবন কেন এত দুঃখময়, মানবিক সম্পর্কগুলো কেন ভেঙে পড়ছে, কোথায় চলেছে মানবসভ্যতা, অস্তিত্বে বিজড়িত এই মৌলিক প্রশ্নগুলি বাঙালি দর্শকদের তিনি ভুলতে দেন নি।"[৪]

সমগ্র নাট্যজীবনে মনোজ মিত্র চেষ্টা করেছেন ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধের রক্ষণ ও লালনের ঃ "My focus has always been on preservation and nourishment of values, of human resources. And then the three elemental realities – sickness, inability and death."[৫]

মানুষের ক্ষুধা, অস্তিত্বের সংকট, লোভ, বেঁচে থাকার প্রবল বাসনা, স্বার্থপরতা, সহমর্মিতা নিয়েই তাঁর নাটক। নিজের কালের সামাজিক-রাজনৈতিক অভিশাপ ও ব্যভিচারের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ করেছেন তিনি। কিন্তু সে ব্যবচ্ছেদ করেছেন কৌতুকের আশ্রয়ে আর সে কৌতুক অনেক সময়ই চোখের জলের কাছাকাছি। যে প্রবল সহানুভূতির বশে আফিমখোর এক ভূয়োদর্শী বৃদ্ধ স্বদেশ ও স্বজাতিকে অশ্রুসজল কৌতুকের তীরে বিদ্ধ করে সংশোধনের পথ দেখাতে চেয়েছিলেন, মনোজ মিত্রের কৌতুক সেই সহানুভূতি-সঞ্জাত। এই কৌতুকের উপাদান আছে তাঁর নিজেরই চরিত্রে। নিজের কৌতুকপ্রিয়তা প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণ ঃ

> "আমার কৌতুকের ঢং খুলনার। ... খুলনার অধিকাংশ মানুষজন রসিক হন। জীবনকে হাল্কা ও সহজ চালে দেখেন। কঠিন ঘটনার মধ্যেও এখানকার মানুষ রসিকতা করেন। খুব দুঃখের মধ্যেও হাসির কথা বলেন। আসলে খুলনা জায়গাটা উর্বর। প্রাচুর্যে ভরা। ফলে এখানকার মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য, চিন্তাহীনতা মানুষকে অলস রসিকতার মেজাজ দিয়েছে। খুলনার রসিকতা খুব জ্বালা ধরায় না, কিন্তু বক্তাকে প্রকাশ করে। অথচ তার বক্তব্যকে উঁচু করে তোলে না। আমার এই মানসিকতাটা আছে।"[৬]

তাঁকে যাঁরা খুব কাছে থেকে দেখেছেন তাঁরা তাঁর রঙ্গপ্রিয়তার গভীরে আবিষ্কার করেছেন মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালোবাসা। এই রঙ্গ ও মমতার স্তর পার হয়ে আর একটু ভেতরে যাবার সুযোগ পেলেই দেখা যায় "একজন নিঃসঙ্গ লোককে, একজন কবিকে।"[৭] ব্যক্তিজীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি মিলেমিশে কীভাবে পূর্ণতা পান শিল্পী তা ধরা পড়ে ঘনিষ্ঠ জনের অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে ঃ "রঙ্গময়তার সঙ্গে, কান্নার সঙ্গে কবিতার মিশেল ... যেমন মানুষ মনোজের চরিত্রের তিনটি প্রধান দিক, তেমনি এই তিনের মিশেলেই গড়ে উঠেছে ওঁর শিল্পীচরিত্র"।[৮] সেই শিল্পীর সহানুভূতি বিস্তৃত হয়, এমনকী 'কাঁঠাল চোরের সঙ্গে চুরির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ' শিয়ালের প্রতিও। সেই সহানুভূতিকে অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক ঃ "প্রাণিজগৎ, নিসর্গপ্রকৃতি, বস্তুজগতের সমন্বয়ে চরাচর উপলব্ধির যে ঐতিহ্য বাঙালির মৌলিক স্বভাবে ঢুকে গেছে, মনোজ মিত্র সেই স্বভাবের প্রতিনিধি।"[৯] দীনবন্ধু

মিত্রের নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় ব্যঙ্গপ্রণালীকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন – রসিক লাঠিয়ালের মোটা লাঠির বাড়ি এবং ডাক্তারের সরু ল্যানসেটের সূক্ষ্ম আঘাত। একালের সমালোচক মনোজের নাটকে এই দুয়েরই উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন ঃ"প্রয়োজনে মোটা লাঠি ব্যবহার করেছেন– আবার প্রয়োজনে সূক্ষ্ম ল্যানসেট; জঞ্জাল যখন পর্বতপ্রমাণ তখন খোলাখুলি আক্রমণে মনোজ সিদ্ধহস্ত; তখন সে (তিনি) মোটা লাঠি-ই বেছে নিয়েছেন।" [১০]

'খাঁটি বাঙালি নাট্যকার' অভিধাটি মনোজ মিত্র সম্পর্কে অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন। এর প্রধান কারণ সম্ভবত মনোজ মিত্রের নাট্যবিষয়ে দেশজ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং সবগুলিই একান্তভাবে মৌলিক নাটক। সচেতনভাবে দেশি বা বিদেশি কোনো নাট্যকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে তিনি নিজে মনে করেন নি। তবে যে কোনো স্রষ্টার মনেই তাঁর পূর্বপাঠ যে কোনো না কোনো ভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাও অস্বীকার করেন নি। এ বিষয়ে দেশীয় নাট্যকারদের মধ্যে তিনি বলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গিরিশ ঘোষের কথা ঃ "Plays by D.L. Roy were fascinating. He painted the scene with impeccable dialogues. His stage direction was fantastic. Girish Chandra Ghosh was also great"[১১] বিদেশি রচনার মধ্যে মনোজ মিত্র উল্লেখ করেছেন রাশিয়ান গল্প-নাটক লেখক, বিশেষত চেকভের কথা। কারণ চেকভ ঃ "suited the Indian or rather Bengali context very well. At least in my eyes."[১২] 'শোভাযাত্রা' নাটকে 'চেকভীয়ান ধাঁচে'র পাশাপাশি ইবসেনীয় স্বাদও যে একেবারে অনুপস্থিত নয়, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার ঃ

> "ইবসেনের নাটকে যেমন অতীত বড় বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে, অতীতটাই অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির চালিকাশক্তির ভূমিকা নেয় এক্ষেত্রেও তো খানিকটা সেরকম হয়েছে। প্রাচীন বংশের ঐতিহ্য চরিত্রগুলির চালিকাশক্তির ভূমিকা নিয়েছে।" [১৩]

ব্রেখটও যে কোনো না কোনোভাবে তাঁর নাটকে প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেকথাও স্বীকার করেছেন তিনি ঃ

> "চরিত্রের থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, আপন মানসিক পরিচয় দেওয়া, এগুলো ব্রেখ্‌টের নাটকে যেমন আছে হুবহু তেমন অবস্থা আমার নাটকে সৃষ্ট না হলেও আমি ঐ বিচ্ছিন্নতাসূত্রের মধ্যে একটা নতুন মজা পেয়েছি। ... আমি Naturalistic Pattern এর মধ্যে সেই মজাটুকু চারিয়ে দেব, হয়ত এখনই দিচ্ছি। ... রীতি এবং প্রকরণ বাদ দিলেও ব্রেখ্‌টের নাটকের আর একটা যে লক্ষণীয় গুণ আমাকে আকৃষ্ট করে, উত্থান-পতনময় একটা নিটোল গল্প। বহু ঘটনা, বহু চরিত্র নিয়ে খুব সোজা এবং রূপকথার মত আকর্ষণীয় কাহিনী বিন্যাস।"[১৪]

কিন্তু তিনি একথাও জানেন যে ঃ "আসলে হুবহু কিছু হয় না, হুবহু কাউকে করাও যায় না।"[১৫]

দীর্ঘ প্রায় পঞ্চান্ন বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে মনোজ মিত্র একষট্টিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন। এই সৃষ্টিমুখর জীবনকে কয়েকেটি পর্বে বিন্যস্ত করা যেতে পারে ঃ

প্রথম পর্ব (১৯৫৯-৭০) ঃ ***পথ সন্ধান*** ঃ এই পর্বে পূর্ণাঙ্গ নাটক বারোটি এবং একাঙ্কের সংখ্যা আট থেকে নয়টি। 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯) একাঙ্ক দিয়ে যে পারিবারিক জীবনের কাহিনি বয়ন

শুরু করলেন, তা ক্রমে প্রসারিত হ'ল 'পাখি' (১৯৬০), 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৭) ও 'কোথায় যাবো' (১৯৬৯) নাটকে। 'নীলকন্ঠের বিষ' (১৯৬০), 'মোরগের ডাক' (১৯৬১), 'আলোক ঝরণা' (১৯৬২), 'অবসন্ন প্রজাপতি' (১৯৬৩), 'ব্ল্যাক প্রিন্স' (১৯৬৪), 'নীলা' (১৯৬৫), 'আরক্ত গোলাপ' (১৯৬৫), 'সিংহদ্বার' (১৯৬৬) প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে এই পর্বে নাট্যকার হিসেবে তৈরি হয়ে উঠছেন মনোজ মিত্র। এর মধ্যে অনেকগুলি নাটকই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, অনেকগুলিই আজ বিস্মৃতপ্রায়, কিন্তু তার মধ্যেও 'নীলকন্ঠের বিষ', 'অবসন্ন প্রজাপতি', 'আরক্ত গোলাপ' প্রভৃতি নাটকে ভবিষ্যতের সফল নাট্যকারের পূর্বসূচনা লক্ষণীয়। তাছাড়া ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত তিনি থাকছেন কোলকাতা থেকে দূরে রাণিগঞ্জে। ফলে তাঁর নাটকের মঞ্চসংযোগ এই সময় সেভাবে ঘটেনি। মঞ্চ-আনুকূল্যের অভাবও উল্লেখযোগ্য নাটক সৃষ্টি না হওয়ার অন্যতম কারণ। এই সময় গবেষণার দিকেও তাঁর ঝোঁক চেপেছিল। ফলে নাটক-থিয়েটার না পড়াশুনো — এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। এরই মধ্যে ১৯৬৩-তে আমরা পেলাম 'অশ্বত্থামা', যা তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। 'অশ্বত্থামা' ১৯৬৩ সালে লেখা হলেও ১৯৭২-৭৩-এ পুনর্লিখিত। এরই মাঝে তিনি মহাভারতীয় বিষয় আশ্রয়ে লিখেছেন আরেকটি একাঙ্ক 'তক্ষক' (১৯৬৭)। ধ্বংস ও মৃত্যুর বিপ্রতীপে সুস্থ সৃজনভাবনা ব্যক্ত হয়েছে এই দু'টি নাটকে। এই পর্বেই তিনি লিখেছেন 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' (১৯৬৬)-এর মতো হিউমার-প্রধান রহস্যনাটক। অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে লেখনী চালনা করে নিজের ঠিক পথটি চিনে নেবার চেষ্টা চলছে। এই পর্বেই তাঁর দৃষ্টি পরিবারের গন্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ মনোজ মিত্রকে দেখি 'নেকড়ে' (১৯৬৮) ও ' চাক ভাঙা মধু ' (১৯৬৯) পূর্ণাঙ্গ নাটক দু'টিতে। বিশেষ একটি মতাদর্শ-অনুসারী সমাজ বদলের ভাবনার আভাস ফুটে উঠেছে এই নাটক দু'টিতে। শোষক-শোষিতের চিরন্তন লড়াই এবং পরিণামে শোষিতের প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে শোষণের অবসান ঘটানোর ছকই এগুলিতে রূপ পেতে থাকে। তবে তার মধ্যে 'নেকড়ে' নাটকে শোষিতের জয় ঘোষণায় তিনি যতটা তীব্র, 'চাক ভাঙা মধু'তে তার পরিবর্তে তাঁর অবলম্বন শোষিতের অসহায়তা, আত্মবিদ্রূপ, হাস্যকর জ্বালা ও যন্ত্রণা। সংঘশক্তির পরিবর্তে অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে বাদামীর একক প্রত্যাঘাত সমালোচিত হলেও উৎপল দত্ত এবং পবিত্র সরকারের মতে, পুরো নাটকের ঘটনাক্রম পেছনে নিয়ে এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া শ্রেণিসংগ্রামের মূল লক্ষ্যকেই সমর্থন জানায়। কিন্তু এই পথ যে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবেন না তিনি, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর পরবর্তী দু'টি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) ও 'পরবাস' (১৯৭০) নাটকে। একই বছরে লেখা এই দু'টি নাটকে তিনি শোনালেন দু'জন অসহায় মানুষের গল্প। 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে যে অসহায়তা ছিল পারিবারিক ক্ষেত্রে তা এখানে বিস্তৃত হয়েছে সামাজিক ক্ষেত্রে। প্রথম নাটকে অসহায়তা শুধু কেনারামের নয়, নগেন পাঁজারও। আর দ্বিতীয় নাটকে অনিকেত গজমাধবের আশ্রয়হীনতার সমস্যা হাসি-অশ্রুর মিশেলে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই শুরু হ'ল মনোজ মিত্রের নাটক রচনার বিশিষ্ট ধরণটি। কৌতুকের আড়ালে টলটলে অশ্রুর মুক্তোবিন্দুটি এখান থেকেই দেখা গেল। ট্রাজি-কমেডি, যা তাঁর মানসমুক্তির প্রধান পথ, তার সন্ধান যেন তিনি পেলেন এখান থেকেই।

১৯৭১-৭৩ কোনো নাটক রচনার সংবাদ নেই, যদিও তিনি তখন কোলকাতাতেই। সম্ভবত

আগামী কয়েকটি বড় সৃষ্টির জন্য তাঁর মানসপ্রস্তুতি চলছে এই সময়। তাছাড়া এইসময় তিনি কোনো থিয়েটার দলের সঙ্গে যুক্ত নন, ফলে বাস্তবের তাগিদও তেমন নেই।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৭৪-৮১) ঃ ***সৃষ্টি মুখর*** ঃ এই পর্বে মনোজ মিত্র পুরোমাত্রায় সৃষ্টিশীল। মাঝে কেবল ১৯৭৫-এ কোনো নাটক নেই। এই পর্বে তাঁর প্রধানতম সৃষ্টি 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭), যা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এই নাটকটি 'বাঞ্ছারামের বাগান' নামে তপন সিংহের পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বহুল প্রচার লাভ করে। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন নাট্যকার। তবে চলচ্চিত্রায়ণের পরও নাটকের জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। এই নাটকেও আমরা দেখি এক অসহায় বৃদ্ধের ক্রমশ কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়ানো। 'তোমার ফলিডল না হয় তুমিই ...' বলে জমিদারের দিকে বাঞ্ছারামের বিষের শিশি বাড়িয়ে ধরা বিশুদ্ধ মনোজীয় ভঙ্গিরই প্রতিবাদ। একেবারে শেষে ঘোষিত হয়েছে, নতুন জীবনের আগমনবার্তা। এই পর্বে তিনটি রাজনৈতিক Satire রচনা করেছেন তিনি -- 'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪), 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) এবং 'রাজদর্শন' (১৯৮১)।

সমকালীন রাজনীতির আদর্শহীনতা, ভ্রষ্টাচার, শোষণ, আত্মসর্বস্বতা এসব নাটকে তাঁর শ্লেষ-ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। 'শিবের অসাধ্যি'তে তিনি সমাজ-বদলের জন্য শোষিত মানুষের জাগরণের ওপরই নির্ভর করেছেন আর 'নরক গুলজার' নাটকে তীব্র ক্রোধে সব শয়তানকে গো-জন্ম দিয়েছেন। 'শিবের অসাধ্যি'তে রাজনীতি-প্রাধান্যের কারণে নাটকত্ব ক্ষুণ্ণ হলেও 'নরক-গুলজার' বক্তব্যপ্রধান হয়েও নাট্যিক শর্ত পূরণ করেছে। 'রাজদর্শন' নাটকে যে রাজনীতি আছে তা কোনো দল বা শ্রেণিকে জোর করে জিতিয়ে দেবার সরল মঞ্চভাবনা নয়। এই রাজনীতি মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে। বহু আশায় যে ক্ষমতা বদল ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে, তা যে সবসময় সুফল দিচ্ছে না, গদি যে মানুষকে কীভাবে বদলে দিচ্ছে তার আভাস যেন আছে 'রাজদর্শন' নাটকে ঃ

> '' 'চাক ভাঙা মধু'র শংকর বা অঘোর, 'শিবের অসাধ্যি'র হাঁদু সিংহি, 'সাজানো বাগান'-এর ছকড়ি-নকড়ির মতো নয় হীরামন বা লম্বোদর, তারা উঠে আসে আমাদেরই আকাঙ্ক্ষার জমি থেকে এবং তারপর লোভে তাদের পা পিছলে যায়। ''[১৬]

এই পর্বে মনোজ মিত্র পেশাদারি মঞ্চের প্রয়োজনে লিখেছেন পারিবারিক নাটক 'দম্পতি' (১৯৭৮), আবার 'পাহাড়ী বিছে' (১৯৭৬-৭৭)-র মতো রহস্য নাটকও সৃষ্টি করেছেন। 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯) নাটকে ব্যবহার করেছেন রূপকথার আঙ্গিক। সাতটি একাঙ্ক নাটকের মধ্যে মদন সিরিজেই তিনটি (আমি মদন বলছি - ১৯৭৪, মদনের পঞ্চকান্ড - ১৯৭৪, বাবুদের ডালকুকুরে - ১৯৮১),'দম্পতি' এবং 'নরক গুলজার'কে একাঙ্ক রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে 'সন্ধ্যাতারা' (১৯৭৯-৮০) এবং 'সত্যি ভূতের গপ্পো'(১৯৮১) নামে। এছাড়া আছে 'তেঁতুলগাছ' এবং প্রধানত 'চোখে আঙুল দাদা' (১৯৭৬)। এই নাটকটি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছে প্রচুর। মনোজ মিত্রের নাটক যে যে কোনো রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকেই আঘাত করে তার প্রমাণ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের শাসনের সময় তাদের বিপরীত মতাদর্শের মানুষের দ্বারা এই নাটকের প্রবল সমালোচনা। একসময় জরুরি অবস্থার সমর্থক বলে এই নাটক সমালোচিত হয়েছে, আবার পরবর্তীকালে বামপন্থী শাসনের সময় বামবিরোধীরা একে বাম-শাসনের সমর্থক বলে সমালোচনা করেছেন।

তৃতীয় পর্ব (১৯৮২-৮৬) ঃ ***অলস কলমচালনা ঃ*** ১৯৮২-৮৩-তে কোনো বড়ো নাটক নেই, কেবল একাঙ্ক 'কাকচরিত্র' (১৯৮২)। সৃষ্টির অপ্রাচুর্যের সেই আক্ষেপই যেন ধ্বনিত হয়েছে এই নাটকের অন্যতম চরিত্র নাট্যকার ব্যোমকেশ বক্সীর সংলাপে ঃ "তুমি তো শালা জানো না, বাংলা থিয়েটারে নাটকের কী ক্যানট্যাংকারাস্ অবস্থা।... মৌলিক নাটক... অরিজিন্যাল প্লে বছরে দেড়খানাও পয়দা হয় না!... পুরো ফ্যামিলি প্ল্যানিং।"[১৭] ১৯৮৪-৮৫ সালে একটিই বড় নাটক – 'নৈশভোজ'। সমাজ-রাজনীতির ভন্ডামির স্বরূপ উন্মোচনে মনোজ মিত্র এখানে নির্মম। ১৯৮৫ সালে রচিত একাঙ্ক 'পাকে-বিপাকে'র বিষয় জোতদার ও চাষীর লড়াই। ভীতুর হদ্দ জনার্দনও শেষ পর্যন্ত স্বজাতিদের জন্য জেগে উঠেছে। 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকায় প্রকাশিত এই নাটকে অনর্থক বক্তৃতা নেই, নাট্যিক শর্ত মেনেই কৌতুকের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যসাধন করেছেন নাট্যকার। জনার্দনের পক্ষে স্বাভাবিক পথেই প্রতিবাদ করেছে, প্রতিশোধ নিয়েছে জনার্দন। ১৯৮৬-৮৭-তে আবার পূর্ণাঙ্গ নাটকের খরা। মাঝে মাঝেই এরকম বিরতি আসলে বড়ো কোনো সৃষ্টির জন্য মানসপ্রস্তুতির কাল। এই বিরতির সময় অভ্যাস রেখে যাওয়ার কারণেই যেন দু'একটি একাঙ্ক লিখে যাওয়া। যেমন ১৯৮৬ সালে লিখলেন দু'টি একাঙ্ক 'মহাবিদ্যা' এবং 'ঘড়ি আংটি ইত্যাদি'। দ্বিতীয়টিতে চরিত্র মাত্র দু'জন। তার মধ্যে একজন, অর্থাৎ বৌ নির্বাক। প্রকৃতপক্ষে এটি একক অভিনয়। বিরতি পর্বে এ যেন আঙ্গিক নিয়ে কৃৎকৌশল।

চতুর্থ পর্ব (১৯৮৮-৯৮) ঃ ***ঐশ্বর্য পর্ব ঃ*** দশটি পূর্ণাঙ্গ এবং নয়টি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন এই পর্বে এবং প্রায় সবগুলিই সৃষ্টি হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রথম প্রবণতাটি হ'ল পারিবারিক জীবন-আশ্রিত নিটোল দুঃখ-সুখের গল্প বয়ন। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৮৮) এই প্রবণতার সার্থক প্রকাশ। এছাড়া 'স্মৃতিসুধা' (১৯৯৩) এবং আত্মগোপন'কে স্থূলভাবে এই ধারারই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। একাঙ্ক সৃষ্টির মধ্যে 'প্রভাত ফিরে এসো'(১৯৮৮), 'আঁখিপল্লব' (১৯৯০), 'দন্তরঙ্গ' (১৯৯২), 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩), 'আকাশচুম্বন' (১৯৯৫) প্রভৃতিও পারিবারিক জীবনের টানাপড়েন, স্নিগ্ধ সহানুভূতি বা জটিল নাগরিক সমস্যার রূপায়ণ। এই পর্বে মনোজ মিত্রের দ্বিতীয় প্রবণতাটি হ'ল অতীত সন্ধান। 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮) থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর এবারের প্রবণতা পেছন ফেরার দিকে, শিকড় সন্ধানের দিকে। এখান থেকে 'শোভাযাত্রা' (১৯৯০), 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯১) হয়ে 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩) 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫), 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-'৯৮) পর্যন্ত যেন শিকড় সন্ধানের দশ বছর। এর মাঝখানে অন্য ধারার নাটক একেবারেই নেই এমন নয়, তবে এই পর্বে মনোজের প্রধান সৃষ্টিগুলিই অতীত-আশ্রিত। এই অতীত চর্চার কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ

> "বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীতচর্চা করেছি। নইলে আর পুরাতনে কী প্রয়োজন? কিছু একটা অনুসন্ধানের জন্যই মাটি খোঁড়াখুড়ি। ...শেকড় জ্যান্ত থাকলে তাতে জলসিঞ্চন করা। তাকে জাগানো, বাড়ানো, ফুল-ফলের স্বপ্ন দেখা।"[১৮]

এই স্বপ্ন দেখা, এই অনুসন্ধান বর্তমানের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানসিক বিশ্রাম পেতেই। আরও বাস্তব প্রয়োজনের কথা তিনি বলেন একই সাক্ষাৎকারে ঃ

> " মানুষ কিন্তু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার জন্যই ঘাঁটে না, তার প্রয়োজনে বর্তমানে লাগে বলেই সে অতীতকে টানে। অনেকসময় বর্তমানকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ধরতে গেলে নানারকম চাপের

মুখোমুখি হতে হয়। বাহ্যিক এবং মানসিক। এরকম একটা প্রয়োজন থেকেও নাট্যকার ফিরে যেতে পারেন অতীতে।" [১৯]

এই বক্তব্যের সূত্রেই অতীত লগ্ন হয়ে গেছে বর্তমানের। সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচকে কিছুটা সহনীয় করে তোলার জন্যই মনোজ মিত্র সময়ের ব্যবধান রচনা করেন। তৃতীয় আর একটি প্রবণতার ইঙ্গিতও এই পর্বে আছে, তা হ'ল রূপকের আশ্রয়ে সমাজ-বিশ্লেষণ। 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৮৯-৯০) এই ধারার পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে' (১৯৮৮) এই পর্বে রচিত কিশোর-নাটক। একাঙ্কগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১), 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' (১৯৯২)। ১৯৬৬ সালে লেখা একাঙ্ক 'বেকার বিদ্যালঙ্কার'কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন এই পর্বে (১৯৯১)।

পঞ্চম পর্ব (১৯৯৯-২০০৯) ঃ ***সৃজনের প্রান্তসীমায়*** ঃ এই পর্বে পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা দশটি। 'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) নাটকে সেই 'rootless, useless fellow' রূপচাঁদের গল্প – যা এক অদ্ভুত বিষণ্ণতাবোধ চারিয়ে দেয়। পরের বছর লিখলেন 'নাকছাবিটা' (২০০০), তার পরের বছর 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' (২০০১)। কৌতুকের আবরণে এই নাটকে মনোজ মিত্রের নারী ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ধারাটির সূচনা 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' থেকে। শেষ পর্বে রচিত তাঁর তিনটি নাটকে একটি মৌল সূত্র আবিষ্কার করা যায়। 'অলকানন্দা' য় যে নারীর গল্প বলতে শুরু করেছিলেন, 'পালিয়ে বেড়ায়', 'নাকছাবিটা' এবং 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে যেন তারই বিস্তার – নারীকে বিভিন্নরূপে দেখা। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকের অসাধারণ মঞ্চসাফল্যের মধ্যেই লেখা হ'ল 'যখন কুলীন ছিলাম' (২০০০)। 'প্রতিকৃতি' নাট্যদল এটি অভিনয় করে, তবে অভিনয় তেমন জমেনি। ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত যথাক্রমে লিখেছেন 'কুহুযামিনী' (২০০২), 'অপারেশন ভোমরাগড়' (২০০৩), 'রঙের হাট' (২০০৪), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), 'ব্রিজের ওপর বাপি' (২০০৬)। এসব নাটকে বলার কথাটি মোটামুটি এক। মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবনকে ইতিবাচকতায় উত্তীর্ণ করে দেওয়া প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলিকে তিনি দেখেছেন জীবনের বিচিত্র প্রেক্ষাপটে। 'কুহুযামিনী'র প্রেক্ষাপট ন্যাশনাল হাইওয়ে, 'রঙের হাট'-এ হাটখোলা, 'ব্রিজের ওপর বাপি'-তে নতুন তৈরি হওয়া একটি ব্রিজ। 'অপারেশন ভোমরাগড়'-এ ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে শ্লেষ-ব্যঙ্গের তীব্র নিক্ষেপ করেছেন। 'যা নেই ভারতে' নাটকে মহাভারতের কাহিনিতে আবিষ্কার করেছেন নতুন সত্য। 'মহাভারত' মহাগ্রন্থে যা নেই, অথচ বর্তমান ভারতে যা সহজলক্ষ্য তাকেই ধরেছেন মনোজ মিত্র মহাভারত-কাহিনির নতুন যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণে। যে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য দেখা গিয়েছিল 'অশ্বত্থামা' বা 'তক্ষক' নাটকে, তা আবার ফিরে এল পঞ্চম পর্বের এই নাটকে। এই ধারাতেই এর পর লিখলেন 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৭) এবং 'হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ' (২০০৯)। এর মধ্যে দ্বিতীয়টিতে কৌতুকরসের প্রাধান্য। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য একাঙ্কগুলি হ'ল 'চমচমকুমার' (২০০২), 'জয়বাবা হনুনাথ' (২০০৪), 'রূপের আড়ালে' (২০০৬), 'বনজোছনা' (২০০৬), 'গন্ধজালে' (২০০৯) প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথম দুটি ছোটোদের নাটক। 'রূপের আড়ালে' নাটকটি মনোজ মিত্রের নাট্যধারায় বিরলতম নেতিবাচক দৃষ্টির অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'বনজোছনা' নাটকে গ্রামবাংলার সাহিত্যসম্পদ সংরক্ষণের কথা বলেছেন তিনি সম্পূর্ণ নাট্যিক শর্ত রক্ষা করে।

১৯৫৯ থেকে ২০০৯ – দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবন পার করে মনোজ মিত্র আজও বিষয় এবং আঙ্গিক সম্পর্কে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানী। আজও তাঁর লেখনী সমভাবে সক্রিয়। হয়তো নিজের শ্রেষ্ঠ লেখাটি এখনো তিনি লেখেন নি, হয়তো আরও অনেক অমূল্য রত্ন প্রসব করবে তাঁর কলম। কিন্তু গবেষণাকর্মে কোনো একটি বিশেষ বিন্দুতে গিয়ে থামতে হয়। আমরা সেই বিন্দুটি ধরেছি ২০০৯ সাল, অর্থাৎ তাঁর নাট্যরচনার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সময়কালকে। এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী সৃজনকর্মে তাঁর নাট্যধারায় পুনরাবৃত্তি প্রায় নেই বললেই চলে। তাঁর রচনাধারা বিবর্তিত হয়েছে, বিবর্ধিত হয়েছে, কিন্তু মৌল লক্ষণগুলি একই থেকেছে। সেই মৌল লক্ষণের কথা মনে রেখেই তাঁর অনুজ নাট্যকার চন্দন সেন লিখেছেন ঃ

> ''সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোন সংবেদনশীল সৃজকের আকাশ তো সূর্যকে সাক্ষী রেখেই রঙ বদলায়। অনিবার্য সেই বদল, – ভেতরের মানুষটার দয়া-মায়া-প্রেম-ভালোবাসা আর সেসবের সঙ্গে গায়ে গা লেপটে থাকা রাগ-ঘৃণা-অভিমান-প্রতিবাদের লালন-মৃত্তিকা কিন্তু বদলায় না।''[২০]

সেই 'লালন-মৃত্তিকা'তেই মনোজ মিত্র লালন করেন বহু বিচিত্র মানুষকে, 'আলোছায়ায় ঘেরা অন্তর্লোকের বাসিন্দা' মানুষকে। বিশেষত যে মানুষেরা প্রান্তিক, যারা অবহেলিত, অপ্রয়োজনীয় বা শারীরিকভাবেপঙ্গু, তাদের প্রতিই মনোজ মিত্রের সহানুভূতি প্রবল। সারাজীবন ধরে এই সহানুভূতির কথা, এই সমানুভূতির কথাই তিনি লিখে চলেছেন। আমাদের আশা এবং কামনা, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন সুস্থ থেকে তিনি করে চলুন ধ্বস্ত মানবতাকে সুস্থ করার কাজ, সব ধুলো ঝেড়ে মানুষকে উজ্জ্বল করে তোলার কাজ।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) মনোজের মনোভূমি -- কুমার রায় -- স্যাস্ -- ১৯৯০, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

২) ঐ, পৃ. ৩৫৪

৩) 'To preserve and nourish values'-Interview to Sankar Majumder-The Statesman - 28/10/2005

৪) বিষ্ণুশর্মার মত দুর্যোগেও তাঁর স্মিত হাসি ঃ শৈবাল মিত্র ৯ আগস্ট ১৯৯২, আজকাল

৫) 'To preserve and nourish values' মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, The Statesman - 28/10/2005

৬) "চেষ্টা করে নাটককে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখব কীভাবে?" - মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার ঃ সঞ্জয় সিংহ।

৭) "মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয়না" - অশোক মুখোপাধ্যায়; আজকাল, ০৯.০৮.১৯৯২

৮) ঐ

৯) বিষ্ণুশর্মার মত দুর্যোগেও তাঁর স্মিত হাসি ঃ শৈবাল মিত্র ৯ আগস্ট ১৯৯২, আজকাল

১০) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্ - ১৯৯০, পৃ.৩৫০

১১) 'To preserve and nourish values' - Interview to Sankar Majumder-The Statesman - 28/10/2005

১২) ঐ

১৩) "থিয়েটার যদি পণ্যের চেহারা নেয় তাতে ক্ষতিটা কী : মনোজ মিত্র" সাক্ষাৎকার - প্রতিদিন - ৮.১০.১৯৯২

১৪) চেতনা নাট্যোৎসবে মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার - ১৯৭৬

১৫) ঐ

১৬) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ - ১৯৯৩, পৃ.৯০

১৭) কাকচরিত্র -- মনোজ মিত্র -- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-প্রথম খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ. ৩৫৭

১৮) কথোপকথন ঃ নাট্যভাবনা - মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার - অনুষ্টুপ নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা ২ - ১৪০৭

১৯) ঐ

২০) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ -- মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-পঞ্চম খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪১৩-এর ভূমিকা -- চন্দন সেন